দৈনিক জনকণ্ঠ ২১

তারিখ ... FEB 12 2000
পৃঃ ৭ কলাম ......

দুর্নীতি ও অব্যবস্থা কবলিত শিক্ষা অবসানের পথ আছে কি?

এসএসসি পরীক্ষাসূচী ॥ পরীক্ষার্থীরা হতাশ

এসএসসি পরীক্ষা-২০০০ সূচী শুধু পরীক্ষার্থীদেরকেই হতাশ করেনি বরং তাদের অভিভাবকদেরকেও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। সরকার ঘোষিত পরীক্ষাসূচী অনুযায়ী ২ মার্চ পরীক্ষা শুরু হয়ে মাত্র ১৩ দিনে ১৫ মার্চ পরীক্ষা শেষ হবে। মাত্র ২ দিন সাপ্তাহিক বন্ধ ব্যতীত পরীক্ষা চলাকালীন আর কোন বিরতি রাখা হয়নি। এমনকি কঠিন বিষয়ের পরীক্ষাগুলোর আগেও কোন বিরতি নেই। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার পূর্বদিন প্রস্তুতির জন্য কোন সময় পাচ্ছে না বললেই চলে। যদিও সবাই জানেন, পরীক্ষার পূর্ব রাতের প্রস্তুতি পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ। এই বিরতিহীন পরীক্ষাসূচীতে পরীক্ষার্থীরা সহজেই অসুস্থ ও ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে। এমনিতেই আমাদের দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ও অবাস্তব, তদুপরি সদ্য ঘোষিত কঠোর পরীক্ষাসূচী ছাত্রছাত্রীদের উপর শারীরিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করবে। সর্বোপরি কোন ছাত্রছাত্রী কোন কারণে একটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে তা সারা বছরের কষ্টসাধ্য চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। উন্নত বিশ্বে এ ধরনের পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন নেই।

জানা গেছে, ঈদ-উল-আযহার পূর্বে পরীক্ষা পর্ব শেষ করার উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু কার স্বার্থে? পরীক্ষা নেয়ার উদ্দেশ্য যদি ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণ হয়ে থাকে তবে এর কর্মসূচী অযৌক্তিক ও অবাস্তব হবে কেন? যথাযথ কর্তৃপক্ষের এই সত্যটি অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, কিশোর পরীক্ষার্থীরা তাদের জীবনে প্রথমবারের মতো একটি পাবলিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ একজন ছাত্রই কেবল এ ধরনের পরীক্ষার মোকাবিলা করতে পারে। উল্লেখ্য, বর্তমান পাঠ্যসূচী এই বছরই শেষ এসএসসি পরীক্ষা। পরবর্তী বছর হতে নতুন পাঠ্যসূচী চালু হচ্ছে। এমতাবস্থায় বর্তমান বছরে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা একটি অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে পড়বে। এছাড়া ইতোমধ্যে পত্রিকান্তরে আমরা জানতে পেরেছি যে, নকল প্রবণতা রোধকল্পে প্রশ্নপত্র কঠিন করা হবে এবং প্রশ্নপত্র নতুন ধরনের করা হবে। এমতাবস্থায় শেষ মুহূর্তের ব্যাপক প্রস্তুতির গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে।

সামগ্রিক বিষয়টি সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গিসহকারে বিবেচনা করে পরীক্ষাসূচী পুনর্তফসিল করার জন্য অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আমরা সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি। যুক্তিযুক্ত বিরতি দিয়ে পরীক্ষার কিছু অংশ ঈদের আগে ও পরে অথবা সম্পূর্ণ পরীক্ষা ঈদের পরে অনুষ্ঠানের জন্য আমরা অনুরোধ রাখছি, যাতে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকসহ সকল দেশবাসী দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারেন।

অভিভাবকদের পক্ষে—

একেএম শাহনওয়াজ
শান্তিনগর, ঢাকা,
মীর নাসির হোসেন
ধানমন্ডি, ঢাকা।

২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষা

আমরা যারা ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে যাচ্ছি তারা '৯৮-এর এপ্রিলে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমাদের ফলাফল বের হয় '৯৮-এর আগস্ট মাসে। এর পর বন্যার কারণে অক্টোবর '৯৮-এ একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে হয়। ফলে ভর্তি হওয়ার আগেই চারটি মাস আমাদের শিক্ষাবর্ষ থেকে হারিয়ে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০০০ সালে ২৭ এপ্রিল থেকে শুরু হবে। তাহলে দু'বছরের জন্য নির্ধারিত সিলেবাস আমাদের মাত্র ১ বছর ৬ মাসে শেষ করতে হচ্ছে। নতুন সিলেবাসে যা প্রায় অসম্ভব।

তাই কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন, ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষা ২০০০ সালের এপ্রিলের পরিবর্তে মে মাসের শেষের দিকে অথবা জুন মাসের প্রথমে নেয়া হোক।

রাসেল ও সজল
ইসলামীয়া কলেজ, কুষ্টিয়া

এসএসসি পরীক্ষার সময়সূচী প্রসঙ্গে

নতুন শতাব্দীর ২ মার্চ হতে শুরু হতে যাচ্ছে ঢাকা বোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষা। ছাত্রছাত্রীর জীবনে এসএসসি পরীক্ষাই সরাসরি বোর্ডের মাধ্যমে প্রথম পরীক্ষা। জীবনের প্রথম বোর্ড পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীর মনে নানান উৎকণ্ঠা ও ভয় থাকে। সেই ভয় ও উৎকণ্ঠাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এবারকার এসএসসি পরীক্ষার রুটিন। মাত্র ১২ দিনে ১১টি পরীক্ষা শেষ করতে হবে। এবার যারা এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের সিলেবাস যথেষ্ট বিশাল এবং উচ্চ মানসম্পন্ন। প্রতিটি পরীক্ষার ভিতর একদিন ছুটি না থাকলে সমস্ত বই রিভাইজ দেয়াও সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি বিষয়ের আগে একদিন ছুটি অত্যাবশ্যকীয়। বিশেষ করে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, অঙ্ক, উচ্চতর গণিত ও হিসাববিদ্যা ইত্যাদি।

অতীতে যত এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে সব পরীক্ষাতেই মাঝে মধ্যে ছুটি ছিল। কিন্তু এবারই কর্তৃপক্ষ কেন যে ১১ দিনে ১২টি পরীক্ষা শেষ করার প্রস্তুতি নিল, বুঝতে পারছি না। একজন সচেতন অভিভাবক হিসাবে এই রুটিনের পরিবর্তন অবশ্যই আশা করছি। প্রতিদিন পরীক্ষা দিতে হলে ছাত্রছাত্রীদের ওপর মানসিক চাপের সৃষ্টি করবে, যা তাদের জন্য মোটেই সুফল বয়ে আনবে না। আমি প্রায় ১০ অভিভাবকের সাথে এ বিষয়টি নিয়ে আলাপ করেছি। তাঁদের সকলের একই অভিমত। একটি পরীক্ষার পর অন্তত একদিন বিরতি রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীরা এ দেশের ভবিষ্যত। তাদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে পরীক্ষার সময়সূচী পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত ও তাদের অভিভাবকদের মতানুসারে সরকারের কাছে বিনীত অনুরোধ, এসএসসির প্রতিটি পরীক্ষার আগে অন্তত একদিন করে যেন বিরতি রাখা হয়, সেদিকে সরকারের সুনজর কামনা করছি।

লুতফে আরা ইসলাম
ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-এবং কোড নম্বর

গত ২৮-১১-৯৯ তারিখে ডিগ্রী পাস সার্টিফিকেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পরীক্ষায় শুধুমাত্র এক বিষয়ে (ইংরেজী আবশ্যিক) অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্রে একটি মাত্র বিষয়ের কোড (১০৫) না এসে মোট ১১টি বিষয়ের কোড আসে। এ রকম সমস্যা হারাগাছ কলেজ, কাউনিয়া কলেজ ও মাহিগঞ্জ কলেজের এক বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের। এক বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের খাতা আলাদা বস্তায় পরীক্ষকের কাছে গেলে খাতা শিথিলভাবে দেখা হবে।

তাই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট আমাদের আবেদন যে, তিনি যেন খাতা পরীক্ষকের কাছে পাঠানোর আগে এ সমস্যার নিরসন করেন। ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে—

ইসমত কাদির ও শামীমা ছন্দা
রংপুর।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ॥ বৈষম্যনীতি প্রসঙ্গে

আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৭ সালের (অনুষ্ঠিত-৯৯-এ) এমএসসি (রসায়ন) পূর্বভাগ পরীক্ষা দিচ্ছি। আমাদের নতুন সিলেবাস অনুযায়ী কমপ্রিহেনসিভ নামক পুরো সিলেবাসের ওপর ৫০ নম্বরের একটি পরীক্ষা আছে, যা পূর্বের (১৯৯৬ সালের) সিলেবাসে ছিল না।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ১৯৯২-এর ৪৬ নং ধারা মোতাবেক প্রণীত এমএসসি কোর্সের জন্য সংশোধিত সিলেবাসের ১০নং ধারায় কমপ্রিহেনসিভ পরীক্ষা (৫০ নম্বরের) উল্লেখ আছে এবং একই ধারায় কমপ্রিহেনসিভ পরীক্ষা সম্পর্কে দেয়া নোটে বলা হয়েছে— সমস্ত সিলেবাসের ওপর ১৫টি প্রশ্ন থাকবে, ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং এই নোটে স্পষ্ট করে আরও উল্লেখ আছে যে, কমপ্রিহেনসিভ পরীক্ষার সময়সীমা আড়াই ঘণ্টা এবং সেই মোতাবেক এমএসসি কোর্সের অন্তর্ভুক্ত অন্য বিষয়গুলোর পরীক্ষা নেয়া হয়েছে (যাদের প্রশ্নপত্রে ২ত(১,২) ঘণ্টা উল্লেখ আছে)। অথচ আমাদের রসায়নের মতো একটি জটিল বিষয়ে সিলেবাসে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও ১০টি প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রশ্নপত্রে ২ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা হয়েছে এবং সেই মোতাবেক পরীক্ষা নেয়া হয়েছে।

এখন আমাদের প্রশ্ন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কি সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্ন প্রণয়ন করে? না মনগড়াভাবে প্রশ্ন করে? না কি প্রিভিয়াসদের অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে? যদি তা না হয়, তাহলে একই সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা দিতে গিয়ে আমরা (রসায়ন) বৈষম্যের শিকার হলাম কেন?

তাছাড়াও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি অনুযায়ী বিগত সালে (এক বছর) থেকে ২০% প্রশ্ন পুনরাবৃত্তির কথা উল্লেখ থাকলেও ১৯৯৬ সালের প্রশ্ন থেকে ১৯৯৭ সালের (অনুঃ-৯৯ই) জন্য রসায়ন

পূর্বভাগের ১০০% প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এটাও বিশ্ববিদ্যালয় নীতিবহির্ভূত একটি দিক।

এ প্রেক্ষাপটেই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সসংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আবেদন, আপনারা বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে এর সমাধান করুন, যাতে ভবিষ্যত প্রজন্মের এমন অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়। সেই সাথে কর্তৃপক্ষের প্রতি বিনীত অনুরোধ, আমরা যারা ২ত(১,২) ঘণ্টার পরিবর্তে ২ ঘণ্টা পরীক্ষা দিলাম, তাদেরকে ৩০ মিনিট সময় পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি সহৃদয়তার দৃষ্টিতে দেখা হোক।

ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে—

আজিব
পরীক্ষার্থী-৯৭, সরকারী আযিযুল হক বিশ্বঃ কলেজ, বগুড়া।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সমীপে

আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৬ সালের অনার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে "পাস ডিগ্রী" পেয়েছিলাম। সিলেবাস বইতে প্রদত্ত রেজুলেশনের ২১(ক) ধারায় উল্লেখ আছে, অনার্স পরীক্ষায় পাসপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী অনার্স ডিগ্রীর জন্য পরবর্তী অনার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে তা প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার ৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।" ১৯৯৬ সালের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার মাত্র ২১ দিন পরে ১৯৯৭ সালের পরীক্ষা শুরু হয় বিধায় সেই পরীক্ষার ফরম পূরণ থেকে বিরত থাকতে হয় এবং ১৯৯৭ সালের প্রিলিমিনারিতে ভর্তি না হয়ে ১৯৯৮ সালের অনার্স পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নিতে থাকি। পরীক্ষাটি ২০০০ সালের ২৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে এক নোটিসে জানতে পারি যে, "পাস ডিগ্রী" প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের আর মান উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না। এ অবস্থায় পরীক্ষার মাত্র কিছু দিন পূর্বে গৃহীত রেজুলেশন বহির্ভূত এমন অমানবিক সিদ্ধান্ত তুলে নিয়ে আমাদের ফরম পূরণ করার সুযোগ দেয়ার আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

১৯৯৬ সালের পরীক্ষায় "পাস ডিগ্রী" প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে

দেবাশীষ সাহা
ঢাকা।

নিয়ম বহির্ভূত কেন্দ্র

সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, হাতিয়া বাংলাদেশের একটি ছোট থানা শহর। এটি একটি দ্বীপ। এখানে একটি সরকারী কলেজ আছে। হাতিয়া দ্বীপ সরকারী কলেজ এতদঞ্চলের শিক্ষার উন্নয়নে যথেষ্ট পদক্ষেপ রাখছে। এখানে প্রথম থেকেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার কেন্দ্র রয়েছে। এখানে পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। নকল প্রবণতার বিরুদ্ধে সরকারী কলেজের ভূমিকা কড়াকড়ি হওয়ায় স্থানীয় একটি বেসরকারী কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতায় উৎকোচের বিনিময়ে (৭০,০০০ টাকা) নিয়ম বহির্ভূতভাবে প্রদান করে কেন্দ্র নিয়ে এসেছে। আসন্ন ডিগ্রী পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিয়ে উক্ত বেসরকারী কলেজটি ছাত্রদের কাছ থেকে ইতোমধ্যেই হাজার হাজার টাকা সংগ্রহ শুরু করেছে। কলেজটি সরকারী কলেজ থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বেসরকারী কলেজটির পরীক্ষার্থী সংখ্যা মাত্র ১২০ জন। নকলের জন্য কলেজটি খ্যাত। সেখানে শিক্ষকরা নিজেরাই নকল সরবরাহ করে। কলেজটিতে দীর্ঘদিন ধরে অধ্যক্ষ ও ইংরেজীসহ আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিক্ষক নেই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির কারণে তারা অবৈধভাবে ডিগ্রী কোর্স চালু করেছে এবং কেন্দ্র নিয়ে এসেছে। অথচ একটি ছোট থানায় সরকারী কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও আরেকটি কেন্দ্রের অনুমোদন দেয়ার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অবৈধ কার্যকলাপে সচেতন শিক্ষিত মহলে ক্ষোভ, বিস্ময় ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি কামনা করছি এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি।

হাতিয়ার সচেতন সমাজের পক্ষে

মিরাজ উদ্দিন
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ॥ অদূরদর্শিতার শিকার ছাত্রসমাজ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনার্স পার্ট-৩ পরীক্ষা অনুষ্ঠান নিয়ে ছাত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে কিছুদিন আগ পর্যন্ত তুলকালাম ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনার জের হিসাবে যা হবার তাই হলো। ভাংচুর, সড়ক অবরোধ— সর্বোপরি জাতীয় জীবনে দুর্ভোগ এবং অনিশ্চয়তা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামক এ নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানটির সম্ভবত একমাত্র দায়িত্ব যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং দ্রুত ফল প্রকাশের মাধ্যমে সেশনজট দূরীকরণ। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। ১৯৯৫ সালের মাস্টার্স শেষ পর্বের (বাংলা) রেজাল্ট ১৯৯৬ সালের অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষার আগের রাতে প্রকাশ করা হয়। এমতাবস্থায় প্রস্তুতি এবং পুনরায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ একজন অকৃতকার্য ছাত্রের পক্ষে কিভাবে সম্ভব?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক উর্ধতন কর্তার মতে, ১৯৯৮ সালের পার্ট-৩ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫ হাজার এবং এর ১০%-এর মতো বিগত বছরের। সংখ্যার বিচারে সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে তুচ্ছ নয়। তাঁর মতে, অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য দুটো পরীক্ষার মাঝে সাত দিন সময় ধার্য করা হয়েছে। এ যুক্তি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তা ভেবে দেখার বিষয়।

"জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব" কর্তৃপক্ষ নিজেদের দোষ ছাত্রদের ঘাড়ে চাপিয়ে মুক্ত হয়েছে সত্যি, কিন্তু তাদের অদূরদর্শিতার এবং অবিমৃশ্যকারিতার ফল ভোগ করতে হচ্ছে গোটা ছাত্র সমাজকে। এ জন্য ১৩ মাস নয়, ৩ মাসে অনার্স/মাস্টার্স পরীক্ষার ফল প্রকাশের বিষয়টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবে কি?

খন্দকার মুস্তাফিজুর রহমান (তুহিন)
রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।
ফরিদপুর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা ॥ এবং বৈষম্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা একেবারে দরজার কাছাকাছি। কিন্তু এখানে ভর্তি পরীক্ষায় এমন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যা অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য তো নয়ই, কোন কোন ক্ষেত্রে তা বৈষম্যের সমতুল্য। আমি মেধা স্কোর নির্ণয়ে ৬% ও ৪% মার্ক ধরার কথা বলছি। আমাদের দেশে ইদানীং নম্বর পাওয়া খুব যে একটা কঠিন ব্যাপার তা বলা যাবে না। তবে তা কোন কোন জায়গায়। আজকাল বেশিরভাগ মফস্বল শহরে, কোন কোন প্রধান শহরের কলেজগুলোতে পরীক্ষার নামে যে নকলের মহড়া চলে, তা নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জেনে থাকবে। তাই ঐ সব তথাকথিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের কাছে নম্বর খুব একটা যে কঠিন ব্যাপার নয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

অথচ এই নম্বর ধরেই আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যাপীঠ বলে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়। এর মানে স্কোর পদ্ধতি ভর্তি পরীক্ষার অগ্রাধিকারকে অনেকখানি ক্ষুণ্ন করে। আমার মতো হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর এ নিয়ে মাথাব্যথা হতো না যদি প্রত্যেকের বাড়ির কাছে এমন সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকত। তা ছাড়া এই স্কোরের কারণে অনেকেই পরীক্ষায় অসদুপায় বেছে নিচ্ছে যা তাদের জীবনে অকল্যাণ বয়ে আনছে না, কারণ তারা তো ভর্তি পরীক্ষায় বৈষম্যের শিকার হচ্ছে না। অকল্যাণ হচ্ছে তাদের যারা পরীক্ষায় সৎ ছিল, ৩১০ মার্ক ব্যবহারিক ছিল না, যারা ঐ সব ছাত্র উৎপাদনের ফ্যাক্টরি থেকে পাস করেনি। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, স্কোর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কমিয়ে ১% অথবা ২% করা হোক।

বিভাষ, তুহীন
নবগ্রাম, মাদারীপুর।